সমুদ্র আইন ১৯৮২ (UNCLOS- III) ও বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ ঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

সানজিদা মুস্তাফিজ*

সারসংক্ষেপ : *সমুদ্রের উপর উপকূলীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা এবং সমুদ্রে অন্যান্য রাষ্ট্রের অধিকারের বিষয়কে কেন্দ্র করেই সমুদ্র আইনের উদ্ভব। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তীদেশ ভারত ও মায়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা চিহ্নিত করণের কাজটি বেশ কঠিন ছিল। পরবর্তী কালে সাফল্যের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত সমস্যা আন্তর্জাতিক সালিশি আদালতের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সালিশি ট্রাইবুন্যালের রায় অনুযায়ী উভয় দেশের সাথে শান্তিপূর্ণ সমাধান ও সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সমুদ্র বিষয়ক ক্ষেত্রে সমঝোতা ও সহযোগীতার নতুন সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন ব্যবহার করে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণের বিষয়টি আইনের ইতিহাসে কিভাবে মূল্যায়িত হতে পারে এবং সমুদ্র সম্পদ ব্যবহারে করণীয় বিষয়ে কি ধরনের উদ্যোগ গৃহীত হতে পারে সে বিষয়টিই এ প্রবন্ধে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।*

সূচক শব্দ: সমুদ্র আইন, সমুদ্রসীমা, সমুদ্র সম্পদ, নীল সমুদ্র অর্থনীতি।

ভূমিকা: বাংলাদেশের দক্ষিণে বিস্তৃত জলরাশি নিয়ে অবস্থান করছে বঙ্গোপসাগর। বঙ্গোপসাগরটি বাংলাদেশ, ভারত ও মায়ানমারের ভূ-ভাগ দ্বারা সংযুক্ত। যে কারনে বঙ্গোপসাগরের উপর নিজেদের সীমানা নির্ধারণ করা নিয়ে প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ ছিল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, যে দেশ তাদের সমুদ্রকে যত বেশি ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে তাদের উন্নয়নের হার তত বেশি। অর্থনৈতিক বিভিন্ন কর্মকান্ডে সমুদ্রের ভূমিকা অনেক। বাংলাদেশে বঙ্গোপসাগরের জলরাশি এবং এর তলদেশের বিভিন্ন জলজসম্পদ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনন্য অবদান রাখতে সক্ষম। একটি দেশের সমুদ্রসীমার ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত থাকে আঞ্চলিক সমুদ্রসীমা আর ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত থাকে একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল। এ সীমানার সব ধরনের প্রাণীজ ও অপ্রাণীজ সম্পদের উপর সেসব দেশের অধিকার থাকে। যা সমুদ্রসীমা আইন UNCLOSE III দ্বারা স্বীকৃত। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশকে না রেখে ভারত ও মায়ানমার সমদূরত্বের ভিত্তিতে রেখা টেনে সমুদ্রসীমা নিজেদের মধ্যে নির্ধারণ করে নেয় (রশিদ, ২০০৮:১৮-১৯)। যেহেতু বাংলাদেশের উপকূলীয় রেখা অবতল আকৃতির সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ তখন ন্যায্যতার ভিত্তিতে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেয়। জাতিসংঘের সমুদ্র আইন কনভেনশন অনুস্বাক্ষরের দশ বছরের মধ্যে ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে মহীসোপানে বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার দাবি জাতিসংঘে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী তথ্য উপাত্ত সহ পেশ করার বাধ্যবাধকতা ছিল। আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনানুযায়ী এ দাবি পেশ করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিধি বিধান মেনে দেশের সমুদ্রসীমার সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রচেষ্টা গৃহীত হয় এবং সমুদ্র সম্পদের টেকসই রক্ষনাবেক্ষণ, সংরক্ষণ, এবং সদ্ব্যবহার করার মাধ্যমে নতুন দিগন্তে দ্বার উন্মোচিত হয়। ভারত এবং মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশ সরকার সমুদ্র সীমার বিরোধ

* সানজিদা মুস্তাফিজ, সহকারী অধ্যাপক (ইতিহাস), সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

সংক্রান্ত বিষয়ে ফলপ্রসু কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পেরে দু'টি মামলা দায়ের করে সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালে (ITLOS- International Tribunal for the Law of the seas) ০৮ অক্টোবর ২০০৯ সালে (Datta, 2014)। আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল দ্বারা দুটি মামলারই নিষ্পত্তি করা হয়েছে যথাক্রমে ২০১২ এবং ২০১৪ সালে। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা হতে তেল গ্যাসসহ বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য আহরণসহ মৎস আহরণ, খাদ্য নিরাপত্তা, যাত্রী ও মালামাল পরিবহন, পর্যটন, সমুদ্র নিরাপত্তাসহ সমুদ্রকে ঘিরে অনেক সুযোগ সুবিধার উদ্ভব হয়েছে। সমুদ্রকে ঘিরে 'নীল সমুদ্র অর্থনীতি' বা 'ব্লু ইকোনোমি' বাংলাদেশের জন্য বিশাল এক সম্ভাবনা। সমুদ্র বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রাচীন কাল থেকেই দক্ষিণের সমুদ্র বাঙালিদের জন্য আশীর্বাদ। পৃথিবীতে প্রায় ৪৯টি দেশের সমুদ্রের সাথে কোন যোগাযোগ নেই কারন এসকল দেশের সবদিক কোন না কোন দেশের ভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছে (geographyrealm.com, 2019)। নৌ পথে এশিয়া অঞ্চলে বঙ্গোপসাগরে ব্যবহার সেই প্রাচীন কাল হতে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাথে প্রাচীনকাল হতেই বাংলার নৌ বাণিজ্য ছিল। শ্রীলংকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের সাথে যাতায়াতের সুবিধার কারণেই সমুদ্র পথে বাণিজ্য পরিচালিত হতো। যা বিভিন্ন পর্যটকদের বিবরণীতে উল্লিখিত আছে (চৌধুরী, ২০০৯: ১০৯)। প্রথম খৃস্টাব্দে কোন এক গ্রীক লেখক কর্তৃক রচিত হয় অসাধারণ এক দালিলিক গ্রন্থ 'পেরিপ্লাস অব দা ইরিত্রিয়ান সী'। সে গ্রন্থে লেখক বর্ণনা করেছেন কি ভাবে গ্রীক বনিকদের জাহাজ লোহিত সাগর দিয়ে আরব সাগর হয়ে বঙ্গোপসাগরের মাধ্যমে পূর্ব ভারতে বাণিজ্য করত। আরব ও রোমান বনিকরাও এ পথ ব্যবহার করে পরবর্তী সময়ে ভারত হয়ে চীন পর্যন্ত বাণিজ্য করতে যেত। প্রথম খৃস্টাব্দের মিশরীয় গনিত ও ভূগোলবিদ টলেমী তাঁর গ্রন্থে বঙ্গোপসাগরের কথা উল্লেখ করেছেন (মান্নান, ২০১৪)। মীর্যা নাথানের 'বাহারিস্তান ই গায়েবিতে' চট্টগ্রাম বন্দর ও বঙ্গোপসাগর নিয়ে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য রয়েছে। আরব লেখকদের মধ্যে সোলাইমান, ইবনে খার্দাদবে, আল মাসুদী, আল ইদ্রিসি, আল মারদাজি, ইবনে বতুতা বর্তমান চট্টগ্রামের কাছে সাদকাউন বন্দরের ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করেছেন (ইসলাম, ২০০৩: ২৭১)। ষোল শতকে পর্তুগীজরা এবং পরবর্তীতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গোপসাগরকে ব্যবহার করেই ব্যবসা পরিচালনা করত।

প্রায় ১৪৭৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত অপার সম্ভাবনাময় সম্পদের উৎস বঙ্গোপসাগর। মাছের খনি হিসেবে চিহ্নিত এ অঞ্চলের আয়তন প্রায় ২২ লাখ বর্গকিলোমিটার। ১৯৫৮ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে মৎস সম্পদের পরিমান নির্ধারণের জন্য মোট ১২টি জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। ১৯৭৯-৮০ সালের জরিপে দেখা যায় নানা প্রজাতির প্রায় ১ লাখ ৬২ হাজার মেট্রিক টন সামুদ্রিক মাছ রয়েছে। সেসাথে এ অঞ্চলে তেল গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনাও প্রচুর। প্রায় ৪০০ কোটি টন বিভিন্ন দ্রবীভূত পদার্থ সমুদ্র তলদেশে বিদ্যমান। গ্যাস উৎপাদনের জন্য বঙ্গোপসাগরের প্রাকৃতিক অবকাঠামোও অনুকূল রয়েছে। বঙ্গোপসাগরে প্রায় ১৬৫ প্রজাতির খাদ্য উপযোগী ও স্বাস্থ্যসম্মত শৈবাল রয়েছে (শহীদুল্লাহ: ২০১৯)। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে প্রথম বারের মত সমুদ্রসীমা নির্ধারণের বিষয়ে একটি বিল সংসদে উত্থাপন করা হয়। যা পরবর্তী কালে আইন আকারে গণ্য করা হয়। তবে এ আইন করার সময় আন্তর্জাতিক আইনের যথাযথ প্রয়োগের ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়।

সমুদ্রসীমা নিয়ে জ্ঞানের স্বল্পতা, তথ্য উপাত্তের অপ্রতুলতা সেসাথে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে দীর্ঘদিন এ আইনের জটিলতার অবসান হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত জটিলতার অবসান না করে বাংলাদেশ যখন সমুদ্রে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য দরপত্র আহ্বান করে তখন পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও মায়ানমারের সাথে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। কেননা এ দু'টি দেশ তখন আন্তর্জাতিক আদালতে সমুদ্র অধিকার বিষয়ে তাদের দাবিনামা উপস্থাপন করে। সমুদ্রকে ঘিরে অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেরও ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে বাংলার বাণিজ্য ছিল সমুদ্রনির্ভর। পরবর্তী সময়ে মধ্যযুগে এবং উপনিবেশের সময়কালেও বাণিজ্যের সমুদ্রনির্ভরতা লক্ষ্যণীয় ছিল। বর্তমান সময়ে সমুদ্রবন্দরগুলোকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে নীল সমুদ্র অর্থনীতিকে অধিক মাত্রায় গতিশীল করা সম্ভব। উক্ত গবেষণা প্রবন্ধে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ এবং সমুদ্র নির্ভর অর্থনীতির গতিশীলতা বৃদ্ধিতে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনের গুরুত্ব পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য: বর্তমান বিশ্বে সমুদ্র আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত। এ প্রবন্ধের লক্ষ্য হলো সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের যেসকল সুযোগ সুবিধা ন্যায্য অধিকারের ভিত্তিতে পাওয়ার কথা তা আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনের সাহায্যে কতটা পেতে সক্ষম হলো তা তুলে ধরা। সেসাথে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনের আলোকে বাংলাদেশ যে সমুদ্রসীমা লাভ করেছে তার পর্যাপ্ত ব্যবহার এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সমুদ্র অর্থনীতিকে কীভাবে গতিশীল করা সম্ভব তা উপস্থাপন করা। সামুদ্রিক মৎস আহরণ, সমুদ্র হতে প্রাপ্ত খাদ্য ও লবণ প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সমুদ্রভিত্তিক পরিবহণের উপর বাংলাদেশের বাণিজ্যিক খাত অনেকাংশে নির্ভরশীল। সেক্ষেত্রে যথাযথ সমুদ্র আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে নিজ দেশের সমুদ্র অঞ্চলে অধিকার দৃঢ় করা ও সমুদ্রভিত্তিক অর্থনৈতিক বিকাশে এ গবেষণা কর্মের যৌক্তিকতা নিহীত।

গবেষণা পদ্ধতি: আন্তর্জাতিক আইনের পর্যালোচনায় বেশ কিছু প্রাথমিক ও গৌণ গবেষণা কর্ম সম্পাদন হয়েছে। এ গবেষণা প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে সমুদ্রকেন্দ্রিক বিভিন্ন ধরনের গৌণ তথ্য ব্যবহার করে গবেষণা কর্মটি এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সমুদ্র ও সমুদ্র আইন বিষয়ক ঐতিহাসিক বিভিন্ন গ্রন্থ, অর্থনীতিবিদদের নানা ধরণের পরিসংখ্যানগত উপাত্ত, দৈনিক পত্রিকাসমূহের প্রতিবেদন হতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্রের সময়কাল, তথ্যের প্রাপ্তিস্থান, তথ্যসূত্রের যোগানদাতা, কোন পরিপ্রেক্ষিতে তথ্যসূত্র তৈরি হয়েছে এবং এসকল প্রাপ্ত তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা কতটা সেসকল বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে (Shafer, 1980)। যেহেতু গৌণ সূত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে গবেষণার ঐতিহাসিকতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তাই তথ্যসমূহকে অন্য তথ্য দ্বারা যাচাই করে ব্যবহার করা হয়েছে। এ বিষয়ে জি. জি. গিলবার্ট প্রদত্ত ধারণার আলোকে গবেষণার কাজটি এগিয়ে নেয়া হয়েছে (Gilbert, 1946)। সেসাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুমান নির্ভরতা, অপ্রতুল তথ্যসূত্র এবং অপর্যাপ্ত বর্ণনার বিষয়গুলোকে বাদ দেয়া হয়েছে।

UNCLOS- III: UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) হলো জাতিসংঘের সমুদ্র আইন সম্পর্কিত সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত রূপ। এ সম্মেলন মাঝে মাঝে সমুদ্র বিষয়ক

সম্মেলনের আইন বা সমুদ্র চুক্তির আইন হিসেবেও অভিহিত হয়। সমুদ্র আইন হিসেবে ১৯৮২ সালের ১৬ নভেম্বর থেকে এর কার্যক্রম শুরু হয়। সমুদ্র আইন হলো সে সমস্ত রীতিনীতি, বিধি বিধান, প্রথা ও নিয়ম কানুনের সমষ্টি যা সমুদ্রে বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক নৌ চলাচল, সমুদ্রে সম্পদ আহরণ এবং সমুদ্রের অন্যান্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে। সমুদ্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তা সমুদ্র আইন নিয়ন্ত্রণ করে। অন্য ভাষায় সমুদ্রে বা বিভিন্ন সামুদ্রিক এলাকায় আইনগত বিধি মোতাবেক সেখানকার রাষ্ট্র সমূহের অধিকার এবং দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে। এক কথায় সমুদ্র ব্যবহার সংক্রান্ত আচার আচরণের সুনিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাই হলো সমুদ্র আইন।

সমুদ্র আইন বিষয়ক ১৯৮২ সালের যে চুক্তি রয়েছে তাতে মোট ৩২০টি ধারা, ১৭টি অধ্যায় এবং ৯টি সংযোজন রয়েছে (Spalding, 2007: 573-583)। UNCLOS -এর পক্ষে ১৬০ সদস্য দেশ থাকলেও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র শুরু হতে এ আইনে সম্মত ছিল না। যেহেতু এ আইনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমুদ্র সৈকত কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তারা সমুদ্রের উপার্জনক্ষম অংশের ন্যায়সঙ্গত বন্টন চেয়েছিল ফলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নিজ আধিপত্য বজায় রাখার জন্য সদস্য হতে চায়নি। যদিও সমুদ্রসীমা, আইন, সমুদ্র সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নীতিমালার বিষয়টি অনেক পুরানো। কলম্বাসের আমেরিকা আবিস্কারের দুই বছর পর প্রথম ১৪৯৪ সালে তৎকালীন পোপ কর্তৃক সাগর মহাসাগরকে ভাগ করা হয়। সমুদ্রে চলাচলের স্বাধীনতার উপর ১৬০৮ সালে ডাচ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির সুবিধার জন্য ও নৌ পরাশক্তিদের সমুদ্র দখলের বিরুদ্ধে হুগো গ্রসিয়াস মতবাদ প্রদান করেছিলেন ১৬০৯ সালে। 'মেরি লাইবেরাম' বা 'দ্যা ফ্রিডম অব দ্যা সীস' বইতে তিনি তার মতবাদ দিয়েছিলেন। সমুদ্র দখলের বিরুদ্ধে তিনি দু'টি যুক্তি তুলে ধরেন; প্রথমত, সমুদ্রকে আসলে কার্যকর ভাবে দখল করা যায়না এবং প্রকৃতি তার সম্পদ কারও একার জন্য বানায়নি। তবে থেমে থাকেনি সমুদ্রের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা। হুগো গ্রসিয়াসের বিপরীতে জন সেলডন 'মেরি ক্লোসাম' (ক্লোস সী বা ডমিনান্স ওভার সী) নামক মতবাদ দেন। তিনি ১৬৩৫ সালে মোটামুটিভাবে সমুদ্রকে ব্যবহার অনুযায়ী ভাগাভাগি করার পক্ষে মতবাদ ব্যক্ত করেন। কর্নেলিয়াস ১৮০০ শতকে 'ক্যানন শট রুল' অর্থাৎ সমুদ্র তীর থেকে তিন মাইল পর্যন্ত দেশের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার জন্য টেরিটোরিয়াল ওয়াটার সৃষ্টি করেন। বিঙ্কারশেকের মত মনীষীরাও এর পক্ষে ছিলেন। পরবর্তীতে আর্বিট্রেশন কোর্ট এবং আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের রায়ের মাধ্যমে স্থায়ী সমুদ্রসীমা আইনের বিকাশ হতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সমুদ্র এলাকার ওপর অনেক দেশ দাবি জানায়। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৫ সালে প্রায় ২০০ মাইল সমুদ্রের ওপর দখল প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান ঘোষনা দেন মার্কিন সমুদ্র মহীসোপানের সব সম্পদ আমেরিকার এখতিয়ারভূক্ত (শহীদুল্লাহ, ২০১৯)।

সমুদ্র সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তির জন্য এবং সমুদ্র এলাকায় সকলের চলাচল এবং মাছ ধরার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ ১৯৫৮ সালে প্রথম 'ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন অন দ্য ল অব দা সী' বা UNCLOS- I এর কনফারেন্স আহ্বান করে। UNCLOS কে বলা হয় 'প্যাকেজ ডিল'। এর মানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ও অঞ্চলের স্বার্থগুলোর সর্বোচ্চ সমন্বয় ঘটেছে এ কনভেনশনে। সেখানে রাষ্ট্রীয় সমুদ্র ও সংলগ্ন অঞ্চল বিষয়ে, উন্মুক্ত সমুদ্র বিষয়ে, উন্মুক্ত সমুদ্রে মৎস শিকার ও সেখানকার প্রাণিজ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে এবং মহীসোপান সংক্রান্ত বিষয়ের উপর চারটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সেসাথে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ বিষয়গুলো অনুমোদন করে। তটরেখা হতে প্রথম ১২ নটিক্যাল মাইল আঞ্চলিক সমুদ্র অঞ্চল, আঞ্চলিক সমুদ্রের পর আরও ১২ নটিক্যাল মাইল ধরা হয় সন্নিহিত অঞ্চল।

তটরেখা হতে ২০০ নটিক্যাল মাইল একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল। ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরের সাগরকে উন্মুক্ত সমুদ্র বলে। পরবর্তী কালে ১৯৬৬ সালের মধ্যে এ চারটি কনভেশন মিলে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনে পরিণত হয়। এরপর ১৯৬৭ সালের মধ্যে ২৫ টি দেশ ৩ মাইল, ৬৬টি দেশ ১২ মাইল এবং ৮টি দেশ ২০০ মাইল টেরিটোরিয়াল সি দাবি করে। এরই প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ ১৯৭০ সালে নতুন করে UNCLOS- III এর প্রস্তাব অনুমোদন করে। জাতিসংঘ ১৯৭৩ সালে বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমুদ্রে বিভিন্ন মেরিটাইম সৃষ্টির বিষয়ে আলোচনা শুরু করে। পরবর্তীতে দীর্ঘ নয় বছর পর জাতিসংঘে অনুমোদন লাভ করে। বাংলাদেশ সহ মোট ১১৯টি দেশ ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে UNCLOS- III স্বাক্ষর করে। এ সনদটি ১৯৯৪ সালের ১৬ নভেম্বর আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত হয় (আবুল হাসান, ২০১৯)। সমুদ্র সীমানা ও সমুদ্র ব্যবহার সম্পর্কীত আইন কার্যকরে পৃথক আদালত রয়েছে যা “International Tribunal for the Law of the Sea/ ITLOS” নামে পরিচিত। ১৯৮২ সালে সমুদ্র আইন নিয়ে জাতিসংঘের তৃতীয় সম্মেলনে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়াও এ সংক্রান্ত “International Court for Justice/ICJ” ও “Permanent Court of Arbitration” নামে আরও দু’টি আদালত রয়েছে।

আন্তর্জাতিক আইনে সমুদ্রসীমার বিভাজন: জাতিসংঘ বর্তমানে যে সমুদ্র আইন (United Nations Convention for Law of the Sea) প্রণয়ন করেছে তা প্রথম গৃহীত হয় ১৯৫৮ সালের UNCLOS-I হিসেবে। এরপর দ্বিতীয়বার ১৯৬০ সালে UNCLOS-II এবং ১৯৮২ সালে UNCLOS-III নামে জাতিসংঘের সমুদ্র আইন, কনভেনশন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে (UN 1987)। সমুদ্রসীমানা সংক্রান্ত জাতিসংঘের এ আন্তর্জাতিক আইন (UNCLOS) অনুসারে কোন দেশের সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল হলো আঞ্চলিক সমুদ্র, ২৪ নটিক্যাল মাইল সন্নিহিত অঞ্চল, ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে পাশ করা হয় (Chowdhury, 2008: 185-201)। এ আইনের মাধ্যমে একই সাথে মহীসোপানের তলদেশ পর্যন্ত সমুদ্র সীমানার বিস্তার ধরা হয় (Houghton, 2010: 813-816)। মহীসোপানের তলদেশে অবস্থিত সব ধরনের প্রাণীজ ও অপ্রাণীজ সম্পদের উপর উক্ত দেশের অধিকার থাকবে। সমুদ্র চুক্তির ৭৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী উপকূলীয় দেশসমূহ মহীসোপানের অধিকার ২০০ নটিক্যাল মাইলের চেয়ে বেশি প্রায় ৩৫০ নটিক্যাল মাইল ব্যবহার করতে পারে। তবে এ বাড়তি অংশ ব্যবহারের জন্য জাতিসংঘের মহীসোপান কমিশনের কাছে তথ্য উপাত্তসহ দাবি জানানোর প্রয়োজন হয়। এ প্রেক্ষাপটে মিয়ানমার ১৬ ডিসেম্বর ২০০৮, ভারত ১১ এপ্রিল ২০০৯ এবং বাংলাদেশ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১ সালে তাদের দাবি উক্ত কমিশনের কাছে উপস্থাপন করে।

সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইনে অভ্যন্তরীণ বা ইন্টারনাল ওয়াটার, টেরিটোরিয়াল সী, কন্টিগিওয়াস জোন, এক্সক্লুসিভ ইকোনোমিক জোন, কন্টিনেন্টাল শেলফ এবং হাই সীজ নামক ছয়টি মেরিটাইম জোন সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব জোনের পরিসর নির্ধারণের জন্য মেরিটাইম বেজ লাইন আঁকার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার তিন বছর পর ১৯৭৪ সালে “The Territorial Water and Maritime Zones Act, 1974” নামে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন করা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪৩ নং অনুচ্ছেদের (২) নং ধারা অনুযায়ী এ আইন করা হয় (Bangladesh Gazette, 1974)। যেখানে ১২ নটিক্যাল মাইল আঞ্চলিক সমুদ্র অঞ্চল, ২০০ নটিক্যাল মাইল অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং এর বাহিরে মহীসোপান অঞ্চল দাবি করে বাংলাদেশের আইনগত কর্তৃত্বের ঘোষণা দেয়া হয়। এ ছাড়া এ আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ৬০ ফুট গভীর পানির উপর বেইজ লাইন তৈরি করেছিল। সেখান থেকেই ১২ মাইল টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স, ৬ মাইল কন্টিগিওয়াস জোন এবং ২০০ মাইল ইকোনোমিক জোন, কনজার্ভেশন

জোন এবং কন্টিনেন্টাল শেলফ দাবি করা হয়। তবে পৃথিবীর কোথাও এ ধরনের বেজ লাইন তৈরির নজির নেই। সেসময় সমুদ্রসীমা নির্ধারণের বিষয়ে পাশ্ববর্তী কোন দেশের সাথে আলোচনা করা হয়নি। এমনকি বেজ লাইন তৈরিতেও আন্তর্জাতিক আইন সেভাবে মানা হয়নি। সেসময় বাংলাদেশ যে বেজ লাইন তৈরি করে তা ভূভাগের কোন অংশ স্পর্শ না করার কারনে ভারত প্রথম প্রতিবাদ জানায়। ভারতের দাবি ছিল বাংলাদেশের সৃষ্ট বেজ লাইন ভারতে ২১ মাইল অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। সেসাথে বাংলাদেশ বেজ লাইনের ভেতরে যে ৬টি বিদেশী কোম্পানীকে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য কাজ দিয়েছিল তা নিয়েও ভারত আপত্তি তোলে। তবে সেসময় ভারতের সাথে এ বিষয়ে কোন আলোচনা না হওয়ার ফলে সমস্যার কোন সমাধান হয়নি।

১৯৮২ সালের জাতিসংঘ সমুদ্র আইনের খসড়া তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল মূলত ১৯৭৩ সালে। বাংলাদেশ এ আইনের খসড়া তৈরির প্রতিটি কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছিল। বাংলাদেশ সরকার প্রণীত সমুদ্র আইনের যে সকল বিষয়সমূহ ভারতের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল তার কোন বিষয়ই বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনে অন্তর্ভূক্ত করতে পারেনি। যেখানে ভারত ও শ্রীলঙ্কা খসড়া তৈরির সময় বেশ কিছু সুবিধা নিয়েছে। জাতিসংঘের সাথে ৮ বছর ধরে আলোচনা করে বাংলাদেশ নিজেদের বেইজ লাইন ঠিক করতে পারেনি। সেসাথে ১৯৮২ সালের সমুদ্র সীমা আইন পাশ হওয়ার পর বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জাতিসংঘে জানানো হয়েছিল যে বাংলাদেশের বেজ লাইন সঠিক। বাংলাদেশ এ চিঠি প্রেরণের পর পরই ভারত ও মায়ানমার জাতিসংঘে এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানায় (আবুল হাসান, ২০১৯)। সমুদ্র আইন হওয়ার প্রায় ১৯ বছর পর বাংলাদেশ সে আইন রেটিফাই করে ২০০১ সালে। আন্তর্জাতিক আইন রেটিফাই করার পর প্রতিটি দেশের নিজেদের জাতীয় আইন পরিবর্ধন বা পরিমার্জন করতে হয়। সময়মত তা করা হয়নি এমনকি দেশীয় আইনে কন্টিগিওয়াস জোন হিসেবে ৬ মাইল এর দাবিকৃত বিষয়টি পর্যন্ত সংশোধন করা হয়নি সেসময়ে। যেখানে আন্তর্জাতিক আইনে কন্টিগিওয়াস জোন উপকূল হতে প্রায় ২৪ মাইল পর্যন্ত। সে সময়কাল হতেই ভারত ও মায়ানমারের সাথে সীমানা নির্ধারন নিয়ে নানান আলোচনা শুরু হয়।

নীল সমুদ্র অর্থনীতি: ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিও শহরে জাতিসংঘের উদ্যোগে ২০১২ সালের ২০-২২ জুন 'টেকসই উন্নয়ন' শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে নীল সমুদ্র অর্থনীতিকে দারিদ্র্য দূরীকরণের অন্যতম মাধ্যম বলে উল্লেখ করা হয় (নাথ, ২০১৪)। সমুদ্র অর্থনীতি ব্যবহারের মাধ্যমে উপকূলীয় ও দ্বীপসমৃদ্ধ দেশগুলোতে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। বেলজিয়ামের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক গুন্টার পাওলী সর্ব প্রথম সমুদ্র অর্থনীতিকে নীল অর্থনীতি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ২০১০ সালে অধ্যাপক গুন্টার পাওলী ভবিষ্যতের অর্থনীতির রূপরেখা প্রণয়নের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক আমন্ত্রিত হন। সেখানে একটি টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব মডেল হিসেবে নীল অর্থনীতির ধারণা ব্যক্ত করেন (Gunter, 2010)। নীল অর্থনীতির অফুরন্ত ভান্ডারকে ব্যবহার করতে বিভিন্ন দেশের কৌশলগত সহযোগীতার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করা হয়। জীবমন্ডলের ৯৫ শতাংশের উৎস হলো সাগর মহাসাগর এবং সাগর ও মহাসাগর মিলে পৃথিবীর প্রায় ৭২ ভাগ অংশ জুড়ে বিস্তৃত (Bhuiyan and Alam, 2014)। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে দেখা যায় পৃথিবীর প্রায় ৮০ শতাংশ ব্যবসা বাণিজ্য চলে সমুদ্র পথে। নীল অর্থনীতিকে গুরুত্ব দেয়া হলেও এর প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে অনেক। তেল গ্যাসসহ বিভিন্ন খনিজ পদার্থ, জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প, সমুদ্র পরিবহন ও পর্যটন, মৎস্য, লবন আহরনসহ বিভিন্ন ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে সমুদ্র কেন্দ্রিক নীল অর্থনীতিকে ঘিরে। বাংলাদেশে নীল অর্থনীতিকে জাগ্রত করতে সর্ব প্রথম যে বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হয় তা হলো সমুদ্রসীমা চিহ্নিত করা।

সমুদ্রসীমা নিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে বিরোধের কারণ: বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জন করার পরই প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মায়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে। শুরুতে বিষয়টি আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও এ বিষয়ে তেমন কোন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না। বাংলাদেশ ২০০৯ সালের জুলাই মাসে এবং ২০১০ সালের জানুয়ারি ও মার্চ মাসে মোট তিন দফায় আলোচনা করে। এছাড়া ভারতের সাথেও ২০০৯ সালের মার্চ এবং ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে সমুদ্রসীমা নিয়ে আলোচনা হয় (হাসান, ২০১৪)। এসকল বৈঠকে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের ভূতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে ন্যায্যতার ভিত্তিতে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করার দাবি উত্থাপন করে। সেসাথে ভারত ও মায়ানমার এ সময় সমদূরত্বের ভিত্তিতে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের কথা উপস্থাপন করে। বাংলাদেশ ২০০৯ সালের ৮ অক্টোবর জাতিসংঘের সমুদ্র আইন (১৯৮২) অনুসারে মায়ানমার ও ভারতের বিরুদ্ধে সালিসি নোটিশ প্রেরণ করে (Hossain, 1981: 274)। তবে একই সঙ্গে দেশগুলোর সাথে আলোচনা করার পথও খোলা ছিল। এ নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে মায়ানমার ও ভারত সমুদ্রসীমা নির্ধারণে উদ্যোগী হয়।

ভারতের সাথে বিরোধ: ভারত বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা বিষয়ে ভারতের পক্ষে যুক্তি ছিল সমদূরত্বের ভিত্তিতে সীমা নির্ধারণ করতে হবে। তবে বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে ইক্যুইটি বা ন্যায্যতার পক্ষে অবস্থান নেয়। যেহেতু বাংলাদেশের উপকূলীয় রেখা অবতল আকৃতির যেকারণে বাংলাদেশ ন্যায্যতার ভিত্তিতে সীমারেখা নির্ধারণের পক্ষে মত উপস্থাপন করে। "The Territorial Water and Maritime Zones Act, 1974" অনুযায়ী ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত আলোচনা শুরু হয়। ১৯৭৪ সালের ১৩ এপ্রিল তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় ঘোষণা করে সমুদ্রতটরেখা হতে ১২ নটিক্যাল মাইল হলো বাংলাদেশের আঞ্চলিক বা উপকূলীয় সমুদ্র অঞ্চল এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলের সীমা হবে সমুদ্র তটরেখা হতে উন্মুক্ত সমুদ্রের ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। বিশেষ ধরনের তটরেখা থাকার কারনে বাংলাদেশ উপকূলীয় সমুদ্রের ১০ ফ্যাদম বা ৬০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত জলসীমা তটরেখার অভ্যন্তরীণ অংশ হিসেবে গ্রহণ করে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ উপকূল রেখা হতে ২৫.৬ কি.মি থেকে ৪৮ কি.মি দূরত্বে ১০ ফ্যাদম গভীরতায় বাংলাদেশের তটরেখা নির্দিষ্ট করা হয়। ভেনিজুয়েলার কারাকাসে জাতিসংঘ আয়োজিত ১৯৭৪ সালের ২৯ জুন এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশ সমুদ্র বিষয়ক দাবি জোড়ালো ভাবে তুলে ধরে। বাংলাদেশ সরকারের একক ভাবে সমুদ্রসীমা আইন ঘোষণা কিংবা তেল অনুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন দেশের সাথে চুক্তি করলে ভারত ১৯৭৪ সালেই এর প্রতিবাদ জানায় এই বলে যে, বাংলাদেশের দাবিকৃত উপকূলীয় সমুদ্রাঞ্চলের মধ্যে ২১ মাইল ভারতের অঞ্চল রয়েছে। পরবর্তীতে ভারত সমদূরত্ব নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের সীমা নির্ধারণের দাবি করে। তবে ভারতের এ প্রস্তাব মেনে নিলে বাংলাদেশ 'Sea Locked Country'তে পরিণত হতো (সেলিম, ২০১৪)। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের দাবি অনুসারে ভূমির মূল বিন্দু হতে ১৮০ ডিগ্রি সোজা রেখা বরাবর সীমারেখা হবে বলা হয়। ভারত এ ক্ষেত্রে সমুদ্রতট অনুযায়ী সীমারেখা নির্ধারণ করে ১৬২ ডিগ্রীতে (মেহেদী, ২০১৪)। মৌখিক শুনানির আগে ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত-বাংলাদেশ উভয়েই আদালতে উপস্থাপন করে নিজ নিজ দেশের সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত যুক্তি ও তথ্য-উপাত্ত। ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের বিষয়টি মায়ানমারের চেয়ে অনেকাংশে বেশ জটিল ছিল। ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ছিল তিনটি দিকে। দক্ষিণ তালপট্টি বা নিউমুর দ্বীপের মালিকানা প্রসঙ্গে, ১২ নটিক্যাল মাইলের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমা নির্ধারণ বিষয়ে এবং আঞ্চলিক ১২ নটিক্যাল মাইল

পানিসীমাসহ ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত একচ্ছত্র অর্থনৈতিক জোন নির্ধারণ করা বিষয়ে (Jones, 2009: 373-381)। ১৯৯৪ সালে আইন কার্যকর হওয়ার পর হতে সমুদ্র বিরোধ নিয়ে যত বিচার হয়েছিল বাংলাদেশ-ভারতের বিরোধ ছিল ১৩তম। হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনার নিচে র‍্যাডক্লিফের দুই ধরণের রেখাটানা মানচিত্র মামলার শুনানির সময় ভারত ও বাংলাদেশ আদালতে উপস্থাপন করে। র‍্যাডক্লিফের স্বাক্ষর সংবলিত যে ম্যাপটি ভারত উপস্থাপন করে তাতে দেখা যায় হাড়িয়াভাঙ্গার মোহনা থেকে রেখাটি ডান দিকে বাঁক নিয়ে নেমে গেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ লন্ডন মিউজিয়াম হতে যে ম্যাপটি সংগ্রহ করে আদালতে উপস্থাপন করে তাতে দেখা যায় মোহনা হতে আড়াআড়ি ভাবে নিচে নেমে গেছে রেখাটি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের দাবি অনুযায়ী স্থল সীমান্ত বিন্দু থেকে ১৮০ ডিগ্রী আড়াআড়ি ভাবে নিচে নামিয়ে এনেছিল সীমান্ত রেখাটি। অথচ ভারতের দাবি অনুযায়ী ১৬২ ডিগ্রি বাঁক নিয়ে রেখাটি নিচে নেমে যায়। আর আদালত যে রায় দিয়েছে তাতে ১৭৭ ডিগ্রী সীমানা রেখাটি নিচে নেমে গেছে। ফলে ভারত দাবিকৃত সীমানা পেয়েছে ২৪ শতাংশ আর বাংলাদেশ পেয়েছে ৭৬ শতাংশ। ফলে বাংলাদেশ প্রাপ্ত অংশ হতে অর্থাৎ ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ কিলোমিটার সমুদ্র এলাকা থেকে জ্বালানি ও অন্যান্য সম্পদ আহরণ করার অধিকার পেয়েছে।

দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের অবস্থান: বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ নিয়ে আশির দশকে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দেয়। ভারত প্রথম বারের মত ১৯৭০ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণে খুলনায় অবস্থিত দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপটির মালিকানা দাবি করে। সেখানে বাংলাদেশ ভারতের সীমানা বিভাজিত করেছে হাড়িয়াভাঙ্গা নদী। তালপট্টি দ্বীপের পূর্বদিকের হাড়িয়াভাঙ্গা ও রায়মঙ্গল নদীর মিলিত স্রোত প্রবাহিত হওয়ার ফলে পানির গভীরতা বেশি হওয়ায় এবং দ্বীপটির পশ্চিমে স্রোত বিদ্যমান থাকায় ভারতের দাবি গ্রহণযোগ্য হয়নি। এ নদীর মূল স্রোত দ্বীপের পশ্চিমাংশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল বলে বাংলাদেশ 'নদীর মূল স্রোতধারার মধ্যরেখা নীতি' অনুসারে এ দ্বীপটিকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল নিজ দেশের সীমারেখায়। তবে এ বিষয়ে ভারতের দাবি ছিল নদীর মূলস্রোত পরিবর্তনশীল। আন্তর্জাতিক সংজ্ঞানুসারে এ দ্বীপটি একটি ভাটার দ্বীপ। ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশ দ্বীপটিকে নিজেদের বলে দাবি করলেও বর্তমানে ঐ দ্বীপটির অস্তিত্ব নেই বলে উল্লেখ করা হয় ফলে তা নিয়ে আদালতের রায় পাওয়ার কোন বিষয় অবশিষ্ট নেই বলে ধরা হয়। যেহেতু ১৯৪৭ সালের র‍্যাডক্লিফের ম্যাপ অনুযায়ী সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হয়েছে ফলে ঐ অংশটি ভারতের দিকেই পড়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে ২০০৯ সাল হতে এ দ্বীপটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়না। ২০০৯ হতে ২০১১ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি'র আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির 'ইনভেন্টরি অব কনফ্লিক্ট এন্ড এনভায়রনমেন্ট' এর এক গবেষণা প্রকল্পের অধীনে এ তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া ২০০৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক সরেজমিনে এ এলাকায় গিয়ে কোন দ্বীপের অস্তিত্ব খুজে পাননি বলে উল্লেখ করেছেন (মান্নান, ২০১৪)। তবে উক্ত দ্বীপ এলাকার মালিকানা ভারতের অধিকারে থাকলে বাংলাদেশ বিপুল সংখ্যক মৎস সম্পদ পেতে ব্যর্থ হবে।

ভারতের সাথে সমুদ্রসীমার বিরোধ নিষ্পত্তি: বাংলাদেশ ও ভারত সমুদ্রসীমা নির্ধারণের লক্ষ্যে ২০১৩ সালের ৯ থেকে ১৮ ডিসেম্বর নেদারল্যান্ডসের রাজধানী হেগে তাদের যুক্তি তর্ক পেশ করে। কার্যবিধির ১৫ ধারা অনুযায়ী ছয় মাস পর এ দু'টি দেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণের রায় দেয়া হবে বলে শুনানি শেষে আদালতের পক্ষ থেকে জানানো হয়। বাংলাদেশের সাথে ভারতের মূল বিরোধের বিষয় ছিল কোথা থেকে দুই দেশের জলসীমা শুরু হবে তা নিয়ে। সেসাথে আরও মতবিরোধ ছিল ভূমিরেখার মূলবিন্দু হতে

সমুদ্ররেখা টানার পদ্ধতি নিয়ে। বাংলাদেশ ও ভারতের উপস্থাপিত যুক্তিতর্ক বিবেচনা করে ২০১৪ সালের ৭ জুলাই সালিশি আদালত রায় প্রদান করে। বাংলাদেশ ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত রায়ে প্রভূত সাফল্য অর্জন করে। এ রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিরোধপূর্ণ ২৫ হাজার ৬০২ বর্গকিলোমিটার সমুদ্রসীমার মধ্যে ১৯ হাজার ৪৭৬ বর্গকিলোমিটার পেতে সক্ষম হয়েছে যা বিরোধপূর্ণ এলাকার প্রায় ৭৬ শতাংশ (রাকিব, ২০১৪)। অন্যদিকে ভারত বিরোধপূর্ণ অঞ্চল হতে পেয়েছে মাত্র ৬ হাজার ১৩৫ বর্গকিলোমিটার। এ রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারের বেশি টেরিটোরিয়াল সমুদ্র, ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম উপকূল হতে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে অবস্থিত সকল প্রকার প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের উপর সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করে। মূলত ১৯৪৭ সালের র‌্যাডক্লিফের ম্যাপ অনুযায়ী সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ভারতের সমুদ্রসীমা নির্ধারণে রায় অনুসারে মূল ভূমিবিন্দু হতে সমুদ্রের দিকে ১৭৭.৩ ডিগ্রী বরাবর রেখা দেখানো হয়েছে। যেখানে ভারতের দাবি ছিল ১৬২ ডিগ্রী বরাবর রেখা টানা এবং বাংলাদেশের ছিল ১৮০ ডিগ্রী বরাবর রেখা টানা (আতিক, ২০১৪)। ভারতের সাথে ১০ টি ব্লকে গভীর সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান করা নিয়ে বাংলাদেশের যে বিরোধ ছিল, সেখানে প্রায় প্রতিটি ব্লকই বাংলাদেশের অধিভূক্ত হয় (Daily Sun, 2014)। মূলত বঙ্গোপসাগরের ২০০ নটিক্যাল মাইলের ভিতর একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে মহিসোপান অঞ্চলে বাংলাদেশের একচ্ছত্র ও সার্বভৌম অধিকার অর্জিত হয়। এছাড়া বাংলাদেশ ৩৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত সামুদ্রিক সম্পদ আহরণের সুবিধা প্রাপ্ত হয়। আন্তর্জাতিক স্থায়ী সালিশি আদালতের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এ রায়টি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ১৯৪৭ সালের রেডক্লিফ কর্তৃক প্রণীত সীমানা নির্ধারণ মানচিত্রকে ব্যবহার করা হয়েছে (Khan, 2014)। দু'টি দেশই UNCLOS -এর অনুসমর্থনকারী দেশ; ভারত ১৯৯৮ এবং বাংলাদেশ ২০০১ সালে অনুসমর্থন করে। সালিশি ট্রাইবুনাল আনক্লজ এবং আইসিজে এর বিখ্যাত সংবিধির বিখ্যাত ৩৮(১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত আন্তর্জাতিক আইনের বিভিন্ন উৎস প্রয়োগ করে রায় দিয়েছেন। এ রায়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সমুদ্রসীমার একটি বড় অংশে নিজ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় সফল হয়।

মায়ানমারের সাথে বিরোধ: সমুদ্রসীমা নিয়ে বাংলাদেশের সাথে মায়ানমারের বিরোধ প্রায় চার দশকের। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ও মায়ানমারের নাফ নদীর মধ্যভাগ ধরে অর্থাৎ বাংলাদেশের সেন্টমার্টিন ও মায়ানমারের ওয়েস্টার দ্বীপের মধ্যভাগে দুই দেশের আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা চুক্তিও ছিল। তখন ১৯৬০ সালের নীতি বলবৎ ছিল এবং আন্তর্জাতিক নিয়ম না মেনেই এ সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছিল। সেন্টমার্টিন জনবহুল ও বাণিজ্যিক স্থানমূলক দ্বীপ হলেও ওয়েস্টার দ্বীপ ছিল জনমানবহীন এলাকা। সেসময় মায়ানমার ইকুইডিসটেন্স লাইন অনুসরণ করে সমুদ্র সীমানা নির্ধারণের প্রস্তাব দেয়। সে প্রস্তাব মেনে নিলে বাংলাদেশকে বিপুল সংখ্যক সমুদ্রসীমা হারাতে হতো। এ বিষয়ে মায়ানমারের সাথে বেশ কয়েকবার আলোচনা হলেও কোন ফলাফল আসেনি।

২০০৮ সালের ১লা নভেম্বর কোরিয়ার ডে'ইউ কোম্পানির ৪টি ড্রিলিং জাহাজ নিয়ে মায়ানমারের নৌবাহনীর সহযোগীতায় তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য বাংলাদেশের সমুদ্রসীমানায় প্রবেশ করে (Firoze, 2012)। বাংলাদেশের বিবেচনায় এটি তার নিজ দেশের সার্বভৌম সমুদ্রসীমায় মায়ানমারের অনুপ্রবেশ ছিল এবং দেশটি এর তীব্র নিন্দা জানায়। সেসাথে বাংলাদেশ কূটনৈতিক ভাবে এর সমাধানেরও চেষ্টা

করে। বাংলাদেশের কূটনৈতিক চাপের মুখে দুই দিন পর মায়ানমার ড্রিলিং জাহাজগুলো সরিয়ে নিয়ে যায়। একই সাথে সেন্টমার্টিন দ্বীপ বাংলাদেশের অংশ হলেও মায়ানমার শুরু থেকেই এর মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করছিল (Rangreji, 2012: 33-58)। এ বিষয়টি মায়ানমার সমুদ্র বিভাজনের সময় হ্যামবুর্গ এজলাসে তুলে ধরেছিল। এছাড়া মায়ানমারের বাধার কারনে বাংলাদেশ তার নিজস্ব সীমানার মধ্যকার তেল-গ্যাস ব্লকগুলো ইজারা দিতে ব্যর্থ হয়। সমদূরত্বের ভিত্তিতে মায়ানমার ও ভারত তাদের সমুদ্রসীমা দাবি করার কারনে বাংলাদেশের সমুদ্র অঞ্চল মাত্র ১৩০ নটিক্যাল মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

মায়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমার বিরোধ নিষ্পত্তি: বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সীমানা চিহ্নিত করে ইটলস ২০১২ সালের ১৪ মার্চ রায় প্রদান করে। এ রায়ে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরে ৮০ হাজার বর্গকিলোমিটারের মধ্যে ৭০ হাজার বর্গকিলোমিটারের উপর কর্তৃত্ব লাভ করে। সেসাথে এ রায়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সেন্টমার্টিন দ্বীপের পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হয়। বাংলাদেশের দাবিকৃত গভীর ও অগভীর সমুদ্রের ২০টি ব্লকের মধ্যে দেশটি ১২টি ব্লকের অধিকার লাভ করে (আহমেদ, ২০১২: ১২-১৩)। আদালত এখানে ন্যায্যতার ভিত্তিতে বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করে। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরের বড় অংশ হতে তেল-গ্যাস উত্তোলনের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকল না। বাংলাদেশকে বঙ্গোপসাগরের ৬৮৫ বর্গকিলোমিটার একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল ও এর বাইরে মহিসোপানে প্রবেশের অনুমতি দেয় সমুদ্র আইন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল (ITLOS)। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বিপুল সম্ভাবনাময় সমুদ্র অঞ্চল নিজেদের দখলে নিতে সক্ষম হয় (Sasba.net, 2019)। ট্রাইবুনাল বাংলাদেশের অবতল সমুদ্রতটের বিষয়টি বিবেচনায় এনে মায়ানমারের সাথে সমদূরত্ব রেখাটি ২১৫০ আজিমুথ বরাবর সরিয়ে উভয় দেশের তটবর্তী ২০০ নটিক্যাল মাইল ইইজেড এলাকা ভাগ করে দেয় (হক, ২০১২)। এ সীমানা নির্ধারণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এখন কোন দেশের বাধা ছাড়াই স্বাধীন ভাবে গভীর সমুদ্র হতে মৎস্য সম্পদ এবং সমুদ্র তলদেশের খনিজ সম্পদ আহরণের উদ্যোগ নিতে সক্ষম।

বাংলাদেশের সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান: বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে প্রথমবারের মত ৬টি বিদেশী আন্তর্জাতিক কোম্পানীর সাথে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য চুক্তি করে। কোম্পানিগুলো হলো আটলান্টিক রিচফিল্ড, ইউনিয়ন অয়েল, এসল্যান্ড, কানাডিয়ান সুপেরিয়র অয়েল, বিওডিসি ও ইনা নাফতাফলিন। সেসময় এসল্যান্ড কোম্পানিকে দেয়া হয়েছিল ভারত সংলগ্ন একটি ব্লক। তখন এসল্যান্ডের প্রধান কার্যালয়ে ভারতের পক্ষ থেকে একটি চিঠি দেয়া হয়। সে চিঠিতে উল্লেখ করা হয় ব্লকে অনুসন্ধানের কাজ চালালে ভারতের পক্ষ থেকে বাধা দেয়া হবে। পরবর্তীতে তারা বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যায়। পেট্রোবাংলা ১৯৯১ সালে ১৮, ১৯, ২০, ২১ এ চারটি ব্লকের ম্যাপ প্রকাশ করেছিল। এর মধ্যে ১৮ নম্বর ব্লকটি ছিল মায়ানমারের সীমানা সংলগ্ন এবং ২১ নম্বরটি ভারতের সীমানার কাছে অবস্থিত। যদিও ব্লক ম্যাপ প্রকাশের পর উল্লেখযোগ্য কোন কাজ তখন হয়নি। এরপরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের হাইকোর্ট এক আদেশ বলে ২০০১ সালের ৩ ডিসেম্বর নিষেধাজ্ঞা জারি করে বাংলাদেশের ২৩টি সেক্টরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের ওপর। সেসময় পেট্রোবাংলার অনুসন্ধানও বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা কেবল সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য বাংলাদেশের হাইকোর্টের অনুমতি চায়। এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৬ সালের ১৬ জুলাই হাইকোর্ট পেট্রোবাংলাকে অনুসন্ধানের অনুমতি দেয়। যদিও অনুমতি পাওয়ার আগেই ২০০৫ সাল হতেই গভীর সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ শুরু করে পেট্রোবাংলা। এছাড়া তৃতীয় বারের মত বাংলাদেশ সরকার বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান করার সিদ্ধান্ত নেয় ২০০৭ সালের এপ্রিল মাসে। একই সাথে উৎপাদন বন্টন চুক্তি বা পিএসসি মডেলও চূড়ান্ত করা হয়। সে মডেল অনুসরণ করেই

বাংলাদেশ সরকার গভীর সমূদ্রে তেল গ্যাস অনুসন্ধান করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ মডেল অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য দরপত্র আহ্বান করে। সেসময়ে স্থল ভাগের ব্লকসহ মোট ব্লক এর সংখ্যা ছিল ৪৭টি। তবে তখন সমুদ্রে-তেল গ্যাস অনুসন্ধানের পূর্বে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করার জন্য নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়। সে প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় কাজ শুরু করে (আবুল হাসান, ২০১৯)।

বাংলাদেশ ২০১১ সালের আগেই পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সাথে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ জাতিসংঘে উত্থাপনের জন্য অগ্রসর হয়। সেখানে প্রায় সাড়ে ৩০০ নটিক্যাল মাইল বা ৬৪৮ দশমিক ২ কিলোমিটার পর্যন্ত বাংলাদেশের সমুদ্রসীমানা ধরে নিয়ে প্রাথমিক ভাবে দাবি জানানোর কাজ শুরু করে। জাতিসংঘের সমুদ্র আইনে আর্টিক্যাল ৭৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ সমুদ্র তটরেখা থেকে ৩৫০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত অধিকার দাবি করে। বাংলাদেশ ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত এমনিতেই পাবে। এছাড়া আরও ১৫০ নটিক্যাল মাইল দাবি করতে গেলে জাতিসংঘে আবেদন করার প্রয়োজন ছিল। এরজন্য প্রয়োজন ছিল বিভিন্ন ধরনের জরিপ পরিচালনা করা এবং সে প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত রায়ের ফলাফল: সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রে মৎস সম্পদ, খনিজ সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে সমুদ্র সম্পদ ব্যবহার করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সমুদ্রের মাধ্যমে পর্যটন খাতে বাংলাদেশ বৈশ্বিক জিডিপিতে ৯ শতাংশ অবদান রাখছে (MoFA, 2014)। গ্যাস ক্ষেত্রে ও জ্বালানি খাতেও এর মাধ্যমে ব্যাপক অবদান রাখা সম্ভব হবে বলে ধারণা করা হয়। এর মাধ্যমে নীল সমুদ্র অর্থনীতির দিকে আগ্রহ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের গ্যাসের মজুদ খুব বেশি নেই যা অল্প দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে (Akram, 2014)। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জিত সমুদ্রসীমায় তেল-গ্যাসের যে মজুদ আছে তা উত্তোলনের ব্যবস্থা করতে হবে। সমুদ্রের খনিজ সম্পদ এবং মৎস্য সম্পদ আহরণের মত পর্যাপ্ত উন্নত যন্ত্রপাতি বাংলাদেশের নেই। সেক্ষেত্রে দক্ষ জনবল তৈরি এবং যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন (রহমান ও ইসলাম, ২০১৪)। সমুদ্র সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের লক্ষ্যে নীল সমুদ্র-অর্থনীতি বা ব্লু ইকোনমি গড়ে তোলার বিষয়ে আরও উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। সমগ্র বিশ্বে প্রায় এক বিলিয়ন মানুষ সামুদ্রিক খাদ্যের উপর নির্ভরশীল এবং প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন মানুষ সামুদ্রিক মাছ আহরণের সাথে যুক্ত যাদের অধিকাংশই উন্নয়নশীল দেশের অধিবাসী (নিশাত, ২০১৪)। মাছ ধরার জন্য বাংলাদেশ এখন গভীর সমুদ্রের বড় একটি অংশ পাচ্ছে। যে কারণে মাছ আহরণ এর জন্য উন্নত প্রযুক্তি ও কলাকৌশল ব্যবহার প্রয়োজন। মৎস সম্পদ অধিদপ্তরের সূত্র মতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে সমুদ্র থেকে আহরণ করা হয়েছে ৭৩ হাজার মেট্রিকটন মাছ (হোসেন, ২০১৪)। পূর্বে যেখানে বাংলাদেশের মাছ ধরার ট্রলারগুলো সমুদ্রসীমার মাত্র ৫ শতাংশ এলাকায় যেতে সক্ষম ছিল এ সময় হতে অর্থাৎ ভারতের সাথে মীমাংসা হওয়ার পর হতে বাকি ৯৫% সমুদ্র অঞ্চলেও তারা যেতে সক্ষম হচ্ছে। যার মাধ্যমে মৎস সম্পদ আহরণের লক্ষ্য মাত্রা আগের চেয়ে অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়া বাংলাদেশের সমুদ্র সীমার মধ্যে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ অঞ্চলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে অসংখ্য জাহাজ চলাচল করে যেখানে বাংলাদেশের চলাচলকৃত জাহাজের সংখ্যা খুব সীমিত। জাহাজ ভাড়া বাবদ বাংলাদেশকে প্রচুর পরিমান অর্থ খরচ করতে হয় (মেহেদী ও বাসার, ২০১৪)। বাংলাদেশের পরিবহন খাতে জাহাজের সংখ্যা বাড়ানো এবং এটি বিনিয়োগের বড় খাত হতে পারে। সেসাথে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের প্রক্রিয়াও এগিয়ে নেয়া প্রয়োজন। তবে সমুদ্র সম্পদ

আহরণের জন্য যে পরিমান দক্ষ জনবল প্রয়োজন তা দেশের ২২টি মেরিন একাডেমী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্রবিজ্ঞান ইন্সটিটিউট হতে কম সময়ের মধ্যে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের সাথে মায়ানমার ও ভারতের সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধের কারণে সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিদেশী কোম্পানিগুলোর অনাগ্রহ ছিল (Fatima, 2014)। আন্তর্জাতিক ভাবে সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ মীমাংসা হওয়ার পর বাংলাদেশের পূর্বের বিরোধপূর্ণ ব্লকে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে আর কোন বাধা থাকল না। বিরোধপূর্ণ অনেক ব্লকই বাংলাদেশের দখলে এসেছে। মায়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা মীমাংসা হওয়ার পরপরই যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ভারতের কিছু কোম্পানী বাংলাদেশের ব্লকে অনুসন্ধানে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তাছাড়া বাংলাদেশ নিজেদের অধিকৃত অভ্যন্তরীন জলরাশি এবং অর্থনৈতিক জোনের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে কৃত্তিম দ্বীপ সৃষ্টি করে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পুনর্বাসন করতে পারে। এ বিষয়টি ১৯৮২ সালের আনক্লোস সম্মেলন দ্বারা বৈধ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে (ইসলাম, ২০০৩: ২২৯)। আদালতের রায়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশাল সমুদ্র অঞ্চলকে ব্যবহার করে বাংলাদেশ অনায়াসে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম।

গবেষণার প্রায়োগিক দিক: সমুদ্র সম্পদ আহরণ বৃদ্ধিতে ও ব্যবহারে করণীয় ক্ষেত্রে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান সমস্যা অনেক দিন ধরে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্থ করেছিল। প্রতিবেশী দু'টি দেশের সাথে শান্তিপূর্ণ এ মীমাংসার মাধ্যমে সমুদ্র সংক্রান্ত সহযোগীতার দ্বার উন্মোচিত হয়। বাংলাদেশের জরিপ অধিদপ্তর বাংলাদেশের স্থল, জল ও আকাশ সীমার সকল রেকর্ডপত্র তৈরি করা, সংরক্ষণ করা ও বিতরণ করার কাজ করে থাকে। এ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে নিস্পত্তি হওয়া সমুদ্রসীমা চিহ্নিত করে তা সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে তা বিতরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড, অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ, একাডেমিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চল বিষয়ে নজর দেয়ার জন্য সমুদ্র বিষয়ক স্বতন্ত্র কমিশন গঠন করা উচিত। পৃথক বাজেট বরাদ্দ রেখে সমুদ্র বিষয়ক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড, গবেষণা, উচ্চ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সমন্বয়সহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সমুদ্রাঞ্চলের নিরাপত্তা, সম্পদের রক্ষণাবেক্ষন এবং টেকসই ব্যবহারের উপর নির্ভর করছে বাংলাদেশের সমুদ্রভিত্তিক উন্নয়ন। এছাড়া বাংলাদেশের মাছের খনিখ্যাত বঙ্গোপসাগরে প্রায় ৪৭৫ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ, ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি, ১৫ প্রজাতির কাঁকড়া, ৫ প্রজাতির লবস্টার, ৩০১ প্রজাতির ওয়েস্টার-শামুক-ঝিনুক, ৫৬ প্রজাতির শৈবাল, ১৩ প্রজাতির প্রবালসহ নানা আহরণযোগ্য ও বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদে পরিপূর্ণ (The Daily Sun, 2014)। সমুদ্রাঞ্চল হতে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে দেশের মোট মৎস আহরণের ১৭ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৫ লাখ ৮৮ হাজার ৯৮৮ টন সামুদ্রিক মাছ আহরণ করে। এছাড়া ইলিশের মোট উৎপাদনের বৃহৎ অংশ সমুদ্র হতেই আসে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ প্রতি বছর বিপুল পরিমান মৎস সম্পদ বিদেশে রপ্তানী করে অনেক বৈদেশিক মূদ্রা অর্জন করে। আন্তর্জাতিক আদালতের রায় অনুযায়ী বাংলাদেশ ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সমুদ্র সীমায় গিয়ে মাছ ধরাতে পারে। অন্যান্য দেশ যেখানে বঙ্গোপসাগর হতে ৬ মিলিয়ন মেট্রিকটন মাছ আহরণ করে সেখানে বাংলাদেশের আহরণের পরিমান মাত্র ০.২৯ মেট্রিক টন। তবে মৎস সম্পদ যাতে অনেক বেশি আহরিত না হয় সে দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। সমুদ্রসীমায় জাহাজে ব্যবহৃত তেল ফেলে যেন পরিবেশ দূষণ না ঘটে সে লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আদালতের রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ যে সমুদ্রসীমা লাভ করল এর মাধ্যমে নিস্পত্তি হওয়া এলাকায় মৎস সম্পদ আহরণ করে জনগণের কর্ম সংস্থান সৃষ্টি, খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা দেয়ার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বজায় থাকবে। এছাড়া গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপনের মাধ্যমে এ খাতকে আরও সমৃদ্ধ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলে তেল ও গ্যাস মজুদ থাকার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত দূর্বলতার কারণে সমুদ্রতলদেশে সম্পদ শনাক্তকরণ, অনুসন্ধান ও পরিমাপ নির্ণয়ের বিষয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়নি। বিশেষজ্ঞদের ধারণা অনুযায়ী বঙ্গোপসাগরে যথেষ্ট পরিমান তেল, গ্যাস, খনিজ দ্রব্যের মজুত আছে। এ পর্যন্ত ভারত ও মায়ানমার বঙ্গোপসাগরে ২৭ টি ব্লকসহ বিভিন্ন ব্লকে প্রায় ১০৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট হাইড্রোকার্বন এর সন্ধান পেয়েছে। আদালতের রায় অনুসারে এর ২২টি ব্লক বাংলাদেশের সীমানায় পরেছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা হাইড্রাকার্বনের যে পরিমান মজুদ আছে ধারণাকৃত এ পরিমান তার খুবই ক্ষুদ্র অংশ (মান্নান, ২০১৪)। যা দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে দেশের বাইরে রপ্তানি করার সম্ভবনা রয়েছে। যার জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও অনুসন্ধান পরিচালনার জন্য যথেষ্ট পরিমান পৃষ্ঠপোষকতা করা। বিদেশের চাহিদা রয়েছে এমন প্রচুর শামুক, ঝিনুক, জেলি ফিশ, কাকড়া, কচ্ছপ, কুমিড়, সি-কিউকাম্বার, সি-আরসিন এবং বিভিন্ন পুষ্টিগুনসম্পন্ন আগাছা সমুদ্র জলসীমানার মধ্যে পাওয়া যায়। যা মানুষের খাদ্য ও ঔষধ তৈরিতে কাজে লাগানো সম্ভব। এছাড়া সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় লবনের উৎপাদন করা হয়। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে লবন উৎপাদন বৃদ্ধি করে তা রপ্তানি করা সম্ভব। বাংলাদেশের সমুদ্র এবং উপকূলীয় জলাঞ্চলের সার্বিক নিরাপত্তা, সম্পদ আহরণের জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ড সাহায্য করছে। আদালতের রায়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হওয়া সমুদ্রাঞ্চলের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য নৌবাহিনীতে প্রয়োজনীয় জাহাজ ও লোকবল সংযোজন করা প্রয়োজন (somudrogupto, 2011:33-35)। বাংলাদেশের নৌ সীমানায় অন্য কোন দেশের ট্রলার এসে যেন মৎস সম্পদ নিয়ে না যেতে পারে সে ব্যবস্থাও করতে হবে। প্রয়োজনীয় লোকবল, অস্ত্র, রণজাহাজের যোগান দিয়ে কোস্টগার্ডের কর্মপরিধি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সেসাথে বাংলাদেশে প্রচুর পরিমানে আমদানি রপ্তানির বাণিজ্যিক পণ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক জাহাজের মাধ্যমে চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দরে আদান প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য এবং অসংখ্য বাংলাদেশী জাহাজ সমুদ্র পরিবহণ ব্যবসার সাথে সংযুক্ত। এর মাধ্যমে দেশে বৃহৎ আকারের শিপিং এজেন্সি, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডিং, ব্যাংকিং এবং বীমা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। এতে করে বৈদেশিক মুদ্রা যেমন সাশ্রয় হচ্ছে তেমনি আবার অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হচ্ছে। সমুদ্র যোগাযোগ ও পরিবহণ খাতে উন্নয়নের মাধ্যমে আরও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। সেসাথে নদীপথে কন্টেইনার পরিবহন ব্যবস্থার জন্য কন্টেইনার টার্মিনাল চালু করতে পারলে এদিকে খরচের মাত্রা অনেক কমে যাবে। তাছাড়া সামুদ্রিক পর্যটনের প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সমুদ্র বর্ষাকালে উত্তাল থাকলেও শীতের মৌসুমে উপকূলীয় এলাকা সমূহে ইকোট্যুরিজমের ব্যবস্থা করা যায়। সমুদ্রপথে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে দেশী-বিদেশী জাহাজের চলাচল ব্যবস্থাও এখন বেশ নিরাপদ। বাংলাদেশ সরকার ভারত, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, মায়ানমার রাষ্ট্রকে নিয়ে একটি আঞ্চলিক পর্যটন অঞ্চল তৈরির পরিকল্পনা বিবেচনাধীন রেখেছে (Askari, 2014: 14-17)। তা ছাড়া সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ প্রদর্শণের জন্য কক্সবাজারে একটি সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ জাদুঘর এবং পর্যটন উন্নয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র গঠন করা যেতে পারে। এর সাথে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে ঐ অঞ্চলকে অর্থনৈতিক ভাবে আরও সমৃদ্ধ করা সম্ভব।

বাংলাদেশে এখন আন্তর্জাতিক মানের জাহাজ তৈরি করা হচ্ছে। খুলনা শিপইয়ার্ডে দেশি জাহাজ মেরামত করা হয় এবং সমুদ্র এলাকায় টহলের জন্য যুদ্ধজাহাজও নির্মান করা হয়েছে। বাংলাদেশে জাহাজ ভাঙা শিল্পের একটি বড় কর্ম পরিসর রয়েছে। চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চলে জাহাজ ভাঙ্গার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থান। এ শিল্পের মানোন্নয়ন করে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। তাছাড়া এ শিল্পের

সাথে জড়িত শ্রমিকদের সার্বিক সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে এ শিল্পের উন্নয়নের দিকে নজর দেয়া প্রয়োজন। একই সাথে সমুদ্রসম্পদ আহরণ ও এর সদ্ব্যবহারের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সমুদ্র সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে হলে সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষার প্রসার ঘটানো দরকার। এ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণায় সরকারি সহযোগীতা দেয়া একান্ত আবশ্যক।

বিভিন্ন প্রকার দূষক পদার্থের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামুদ্রিক পরিবেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে দূষিত হচ্ছে। সমুদ্র উপকূলে গ্যাস ক্ষেত্র আবিস্কারের লক্ষ্যে খনন, উপকূলবর্তী দ্বীপে বালি ও ভারি মনিক আহরণের ফলে সমুদ্রের পরিবেশ মারাত্মক ভাবে দূষিত হচ্ছে। এছাড়া সাগরে পেট্রোলিয়ামবাহী ট্যাঙ্কার চলাচল, বন্দরে তেল খালাস ও বোঝাই, পেট্রোলিয়াম প্রক্রিয়াজাত কারখানা হতে নির্গত বর্জ্য হতে সাগরে দূষণ ঘটছে। সেসাথে বুড়িগঙ্গা, কর্ণফুলি ও পশুর নদীর দ্বারা বঙ্গোপসাগরে পয়ঃনিষ্কাশন করার মাধ্যমে এবং শিল্পবর্জ্য ও বিভিন্ন মানবীয় কর্মকান্ডের মাধ্যমে সমুদ্র দূষণ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের “The Territorial Water and Maritime Zones Act, 1974” নামক আইনে সামুদ্রিক দূষণ সম্পর্কীত কিছু ধারা রয়েছে, উক্ত আইনের ৬ নং ধারা অনুযায়ী জীব বৈচিত্র রক্ষার জন্য সরকার সমুদ্রে সংরক্ষিত এলাকা তৈরি করতে পারে (Vidas, 2001: 20)। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ **১৯৭১** সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে সামুদ্রিক মৎস সম্পদ শনাক্তকরণ, প্রাচুর্যতা নির্ণয় করা, আহরণ, প্রক্রিয়াকরণ, গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, সামুদ্রিক পরিবেশদূষণ ব্যবস্থাপনা, চিংড়ি চাষ ও চিংড়ির পোনা উৎপাদন করতে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে সহযোগীতা করছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রতি বছর সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয় হতে পাশ করে বের হওয়া শিক্ষার্থীদের কাজে লাগিয়ে সমুদ্রসম্পদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব। এসকল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ বিষয়ক গবেষণা বরাদ্দ বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

উপসংহারঃ আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে ২০১২ সালের ৭ জুলাই এবং ২০১৪ সালের ১৪ মার্চ বাংলাদেশ তার সমুদ্রসীমায় সার্বভৌম ক্ষমতা অর্জন করে। তবে শুধুমাত্র সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠাই শেষ কথা নয়। এর পরবর্তী ধাপে বাংলাদেশকে সামুদ্রিক মানচিত্র তৈরি করে সমুদ্র জরিপ, মৎস ও সমুদ্র সম্পদ আহরণ, নৌ চলাচল ও সমুদ্র পর্যটনে নিরাপত্তা বিধান করার বিষয়সমূহে গুরুত্বারোপ করতে হবে। উন্নত দেশসমূহ হতে সমুদ্র বিষয়ক কারিগরি জ্ঞান অর্জন করতে হবে। নীল সমুদ্র অর্থনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সংরক্ষনে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এর মাধ্যমে দারিদ্রদূরীকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। বর্তমান সময়ে স্থলভাগের সাথে সমুদ্র সম্পদ ব্যবহার করেই উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। সমুদ্রকে ব্যবহার করে অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অধিক বৈদেশিক মূদ্রা অর্জন করা সম্ভব। নদীমাতৃক বাংলাদেশের ধারণা হতে সমুদ্র কেন্দ্রীক বাংলাদেশের চিন্তা করা সময়ের দাবি মাত্র। সমুদ্রকে ব্যবহার করে যথাযথ উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের জন্য বড় হুমকি। সমুদ্রসীমার উচ্চতা বৃদ্ধি, সহ সাইক্লোন, বন্যা, খড়ার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট। ফলে বঙ্গোপসাগরকে নিয়ে অসীম সম্ভাবনার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জও রয়েছে। আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন অনুসরণ করে এবং সমুদ্র সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনায় দেশীয় আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা অতীব জরুরী। তা না হলে সমুদ্র সীমা অর্জনের প্রকৃত সুফল পেতে ব্যর্থ হবে বাংলাদেশ।

তথ্যসূত্র

গ্রন্থপঞ্জি

J. Garraghan Gilbert (1946): *'A Guide to Historical Method'*, Fordham University press, Newyork.

Pauli Gunter (2010): *'The Blue Economy; 10 years – 100 innovations – 10 million jobs'*, Paradigm Publications, USA.

R.J Shafer (1980): *'A Guide to Historical Method'*, The Dorsey press, Illinois.

Davor Vidas (2001): *'Protecting the Polar Marine Environment Laws and Policy for Pollution Prevention'*, Cambridge University Press.

সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) (২০০৩): *বাংলাপিডিয়া*, সিফাতুল কাদো চৌধুরী, *'বঙ্গোপসাগর'*, খন্ড-৬, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) (২০০৩): *বাংলাপিডিয়া*, সৈয়দ রাশেদুল হাসান, *'পর্যটন'*, খন্ড-৫, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

আব্দুল মোমিন চৌধুরী (২০০৯): *'প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি'*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

পত্রিকা

Shabbir Ahmed Chowdhury (2008): *"Delimination of Maritime Boundaries of Bangladesh: Problems and Prospects,"* NDC Journal, Vol. 7, No. 1.

K. J. Hughton (2010): *"Maritime Youndaries in a Rising Sea,"* Nature Geosciences, Vol.3, No.12.

Hossain (1981): *"Bangladesh-India Relations:Issues and Problems,"* Asian Survey, Vol. XXI.

d. Jones (2009): *"Sovereignty and Statelessness in the Border Enclaves of India and Bangladesh,"* Political Geography, Vol.28, No. 6.

MoFA (2014): *"Concept Paper on Ocean/Blue Economy-Modern Economic Vision,"* paper Presented by Ministry of Foreign Affairs at on International Seminar on Ocean/Blue Economy, Dhaka, February.

Luther Rangreji (2012): *"Bangladesh-Myanmar Maritime Boundary Delimitation Dispute,"* Journal of International Affairs, Vol. 16, No. 1 & 2.

M. D. Spalding et al. (2007): *"Marine Eco regions of the World: A Bio Region Alization of Coastal and shelf Areas,"* Bioscience 57(7).

Nirvik Somudrogupto (2011), *"Maritime Security for Energy Security,"* Bangladesh Defense Journal, Vol. 1, No. 43, October.

United Nations (1987): *"Office for Ocean Affairs and the Law of the Sea,"* Maritime Boundary Agreements (1970-1984), New York, Vol. XVIII, P.297

সংবাদপত্র

Saleh Akram (2014): *"Survey of Marine Resources Brooks No Delay," The Financial Express*, Dhaka, 20 July.

Rashid Askari (2014): *"Conquests of the Bay: The Herald of a New Maritime Era," Dhaka Courier*, Dhaka, Vol .31, No. 1, 18 July.

Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974, The Bangladesh Gazette, Extra, Feb 14, 1974.

Kamal Uddin Bhuiyan, Md. Jahangir Alam (2014): *"Integrated Maritime Policy to Boost Blue Economy", The Daily Star*, Dhaka, 19 October.

Bishwajit Datta (2014), : *"Equity Over Equidistance: A New Hope" The New Age*, Dhaka, 21 July.

Daily Sun (2014),: *"A Historic Win for Bangladesh", The Daily Sun*, Dhaka, 09 July.

Daily Sun (2014): *"No Preparations to Exploit Huge Opportunity", The Daily Sun*, Dhaka, 9 July.
Kaniz Fatima (2014): *"Untapped Seabed Resources", The Independent*, Dhaka, 20 July.
Adnan Firoze (2012),: *"Bangladesh-Myanmar Maritime Dispute: What Actually Happened?" Dhaka Courier*, Dhaka, Bangladesh.
Sharier Khan (2014): *"Verdict Brings New Hope", The Daily Star*, Dhaka, 19 July.
শামিম আহমেদ (২০১২): *"সমুদ্র বিজয়", সাপ্তাহিক ঢাকা কুরিয়ার*, ঢাকা, খন্ড ২৮, সংখ্যা ৩৬, ২৩ মার্চ।
আবুল হাসান (২০১৯): *"বেদখল হচ্ছে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা", সাপ্তাহিক*, ঢাকা, বর্ষ ১১, সংখ্যা ৩০, ১৭ জানুয়ারি।
আতিক আহমদ (২০১৪): *"রায় বাংলাদেশের পক্ষে", দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা, ০৮ জুলাই ।
হারুন অর রশিদ (২০০৮): *"সমুদ্রসীমা নির্ণয়ের আইন", ঢাকা কুরিয়ার*, সাপ্তাহিক, ঢাকা, খন্ড-২৪, সংখ্যা-৩৯, ১৮ এপ্রিল।
ধীরাজ কুমার নাথ (২০১৪): *"নীল অর্থনীতি খুলে দেবে সম্পদের সিংহ দুয়ার", দৈনিক যুগান্তর*, ঢাকা, ২ সেপ্টেম্বর।
আইনুন নিশাত (২০১৪): *"সমুদ্রসীমা মীমাংসা এখন প্রয়োজন সংরক্ষন ও সদ্ব্যবহার, দৈনিক সমকাল*, ঢাকা, ০৯ জুলাই।
ম এনামুল হক (২০১২): *"সমুদ্রসীমা বিষয়ক রায়: কতটা জয়", প্রথম আলো*, ঢাকা, ৩০ মার্চ । Retrieved from- http://archive.prothom-alo.com/detail/date/২০১২-০৩-৩০/news/২৩৬৪৫২
মেহেদী হাসান (২০১৪): *"ন্যায্যতা ও বন্ধুত্বেও জয়", দৈনিক কালেরকণ্ঠ*, ঢাকা, ৮ জুলাই।
মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন (২০১৪): *"সমুদ্র সম্পদ ব্যবস্থাপনায় মহাপরিকল্পনা দরকার", দৈনিক কালেরকণ্ঠ*, ঢাকা, ১৪ জুলাই।
আব্দুল মান্নান (২০১৪): *"বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নিয়ে অর্থনীতির সহজ পাঠ", কমিউনিটি নিউজ জাপান*, ১৭ জুলাই। Retrieved from- http://community.skynetjp.com/id৯৯৪.htm
রাশেদ মেহেদী (২০১৪): *"সমুদ্র জয়ের নতুন ইতিহাস", দৈনিক সমকাল*, ঢাকা, ৯ জুলাই, ঢাকা।
রাশেদ মেহেদী ও রফিকুল বাসার (২০১৪): *"সাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান জোরদার করবে পেট্রোবাংলা", দৈনিক সমকাল*, ঢাকা, ১০ জুলাই।
মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (২০১৯): *"সমুদ্রসীমা অর্জন ও রক্ষা", সাপ্তাহিক*, ঢাকা, ১৭ জানুয়ারি।
মোহাম্মদ সেলিম (২০১৪): *"ভারত-বাংলাদেশ সমুদ্রসীমা নির্ধারণ, আইনী জয়ের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত", বিডি নিউজ ২৪*, ঢাকা, ১১ জুলাই ২০১৪। Retrieved from- https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/19134
হাসনাত রাকিব (২০১৪): *"সমুদ্রসীমা রায়ে বাংলাদেশের অধিকার নিশ্চিত", বিবিসি বাংলা*, ঢাকা, ৯ জুলাই।
আরিফুর রহমান ও রফিকুল ইসলাম (২০১৪): *"অপার সম্ভাবনা কাজে লাগানোর প্রস্তুতি নেই", দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ঢাকা, ০৯ জুলাই।

ওয়েব সাইট

Retrieved from- http://sasba.net/news/burma-bangladesh-maritime-dispute-ends-accessed 0n 08 july, 2019.
Retrieved from- https://www.geographyrealm.com/landlocked-countries/ on 07 July, 2019.